প্রথম আলো

শিক্ষার্থীদের আত্মহনন

এ দায় আমাদের, এ দায় প্রশাসনের

জোবাইদা নাসরীন

২৯ অক্টোবর ২০১৮, ১১:৫৪
আপডেট: ২৯ অক্টোবর ২০১৮, ১১:৫৬

চলতি বছরে এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। পারিবারিক সমস্যা, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের অসম্মান তাঁদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে। সর্বশেষ আত্মহত্যা করেছেন রংপুরের পীরগঞ্জের কুমেদপুর ইউনিয়নের বগেরবাড়ী গ্রামের হতদরিদ্র কৃষক মোস্তাফিজার রহমানের তৃতীয় সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র জাকির হোসেন। পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে গত রোববার রাতে মা-বাবার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয় জাকির হোসেনের। পরে সবার অজান্তে নিজ ঘরে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। জাকির হোসেন ডায়েরির পাতায় ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়’—এই সুইসাইড নোট লিখে গেছেন। তবে আমরা বুঝতে পেরেছি অভাব-অনটনই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী।

এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেন। কুষ্টিয়ার একটি গ্রাম থেকে এসেছিলেন তরুণ হোসাইন নামের ওই ছাত্র। সুযোগ পেয়েছিলেন বাণিজ্য অনুষদের ‘বনেদি’ বিষয়ে পড়াশোনা করার। স্যার এ এফ রহমান হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন তিনি। থাকতেন ১১৩ নম্বর কক্ষে, যেটি ওই হলের গণরুম হিসেবে পরিচিত। পত্রিকার খবর থেকে জেনেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘চাকচিক্যের’ ঝলকানিতে ভরপুর বাণিজ্য অনুষদের ফিন্যান্স বিভাগে কোনো এক কোর্সের প্রেজেন্টেশনের (উপস্থাপনা) সময় অন্যদের মতো চটপটে ইংরেজি বলতে না পারায় শিক্ষকের উপস্থিতিতে তরুণকে পড়তে হয়েছিল

বিব্রতকর পরিস্থিতিতে। ফিন্যান্স বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থীর মুখ থেকে জানা যায়, তরুণের আত্মহত্যার প্রধানতম কারণ হলো বিভাগের চাপ। কারণ, প্রথম বর্ষের প্রথম সেমিস্টারের একটি কোর্সে বারবার মানোন্নয়ন দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর ফল ভালো হচ্ছিল না। তরুণ বিভাগ থেকে পাস করতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে তাঁর বন্ধুদের সংশয়ের কথা বলতেন। দরিদ্র পরিবারের সন্তান তরুণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার আশঙ্কায় অনেকটাই ভীত ছিলেন।

তরুণের বন্ধু এম এস আই খান এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছিলেন, ‘গণরুমে তরুণ ছিল সবচেয়ে নিরীহ একটি ছেলে। শৈশবে মা-হারা অযত্নে বড় হওয়া এই ছেলেটি ২০১৫-১৬ সেশনে ভর্তি হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগে। আর্থিক সংকটে জর্জরিত ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থেকে নানা কারণে চরম হতাশায় ভুগতে শুরু করে। তার শারীরিক গঠন ও দেহের কালো রঙের কারণে অনেকের কাছেই সে যেন একটু বেশিই নিগৃহীত হতো।’ গণরুমে তাঁর বন্ধুরা নানা সময় বিভিন্নভাবে তাঁকে উপহাস করতেন। এ ধরনের উপহাসের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থীই ঠিকভাবে শিক্ষাজীবন শেষ করতে পারেন না।

এ বছরের মার্চ মাসেই আত্মহত্যা করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন শিক্ষার্থী। গত ১৭ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের একজন ছাত্র আত্মহত্যা করেন। তরুণ ও জাকিরের ঘটনা যখন পড়ছিলাম, তখন মনে পড়ছিল আমারই বিভাগের এক ছাত্রের কথা। আমি ভাবছিলাম আমার ছাত্রটিরও পরিসমাপ্তি হতে পারত তরুণ ও জাকিরের মতো। তিনি ক্ষোভে, যন্ত্রণায়, অসম্মানে আত্মহত্যা করতে পারতেন। একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর একটি কোর্সের খারাপ ফল হওয়ার কারণে তিনি অনেক পিছিয়ে গেছেন। সেটিরও কারণ ছিল এমনই পীড়ন। খুব কষ্ট নিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি দরিদ্র ছাত্র বলে ওই গণরুমের প্রায় সব ছাত্র আমাকে উপহাস করতেন। তাঁদের কোনো কিছু হারালে প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন এবং সন্দেহ করতেন। সেই পরীক্ষার আগের রাতে গণরুমের এক বড় ভাইয়ের মোবাইল ফোন হারানো যায় এবং তিনি আমাকে সন্দেহ করে নিয়ে যান আরেক রুমে। সেখানে আমাকে মানসিকভাবে নিপীড়ন করেন এবং বেঁধে রাখেন। সারা রাত আমাকে বেঁধে রেখেছিলেন। আমি অনেক কান্নাকাটি করে বলেছি, আমার পরীক্ষা পরের দিন। কিন্তু আমাকে সারা রাত আটকে রেখেছিলেন, আমার একটাই দোষ—তাঁরা জানতেন আমি দরিদ্র পরিবারের সন্তান, টিউশনি করে বেঁচে আছি। পরের দিন যখন সেই ভাইয়ার মোবাইল ফোন পাওয়া গেল অন্য জায়গায় এবং আমাকে ছেড়ে দিলেন, তখন অলরেডি সকাল সাড়ে ১০টা, যেখানে আমার পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে সকাল ৯টায়। আমি যখন পরীক্ষার হলে পৌঁছালাম, তখন ১০টা ৪৫। পরীক্ষা তো শেষ হলো ১২টায়। তাহলে কীভাবে ভালো করব?’

বাংলাদেশে এখনো অনেক দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করার সুযোগ পান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ শিক্ষার্থী নিজেরাই টিউশনি করে কিংবা পার্টটাইম জব করে নিজেদের খরচ মেটান। আবার

কেউ কেউ আছেন, যাঁদের নিজেদের প্রয়োজনের সঙ্গে পরিবারের খরচ মেটাতে হয়। সে জন্য তাঁদের একটির পরিবর্তে হয়তো তিন-চারটি টিউশনি করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগে দরিদ্র তহবিলের যে টাকা রয়েছে, সেটি কেবল এককালীন দুই থেকে চার হাজার টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে আর কিছুই নেই। দু-একটি বিভাগ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ফান্ড করে শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। যে শিক্ষার্থীকে তিন-চারটি টিউশনি করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে শুধু বেঁচে থাকার স্বপ্নটাই প্রথমে পূরণ করতে হয়, সেই শিক্ষার্থীর কাছে আমরা প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি কিংবা ঠিক সময়ে অ্যাসাইনমেন্ট আশা করতে পারি না। এর পাশাপাশি অনেকেই হলমেট, রুমমেট কিংবা সহপাঠীদের কাছ থেকে হেনস্তার শিকার হন। পরিস্থিতি যখন এ অবস্থায় দাঁড়ায়, তখন অনেকের কাছেই জীবন বোঝা মনে হতে পারে। যে কারণে তাঁদের কেউ কেউ বেছে নিচ্ছেন আত্মহত্যার মতো পথ। আমরা শিক্ষক হিসেবে কয়জন শিক্ষার্থীর খবর রাখি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি বিভাগে কতজন আর্থিক অসচ্ছল শিক্ষার্থী আছেন, আমরা জানি না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর পরেই জানা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক রাজনীতির নানা টানাপোড়েন, ক্ষমতাসীন সংগঠনের আধিপত্য বিস্তারের নানা ধরন–সব খবরই আমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের নেওয়া প্রয়োজন, এই দাবি কারও কাছ থেকেই আসেনি। শিক্ষার্থীরা দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে লড়তে আত্মহত্যা করার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রামের বাড়িতে তাঁদের লাশ পাঠিয়ে দেয়। তারপর ‘আহা ছাত্রটি মেধাবী ছিল, তার মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না’–এই জাতীয় বাক্যের মধ্যেই তাদের দায়িত্ব শেষ করে।

শিক্ষার্থীদের বিষয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অনেক বেশি মানবিক হওয়া জরুরি। কিন্তু বাস্তবে আমাদের ঝোঁক অন্যদিকে, অন্য কোথাও। তাই আমরা শিক্ষার্থীদের জীবনের বোঝাপড়ার নিদারুণ সংগ্রামটি দেখতে পাই না।

জোবাইদা নাসরীন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক

zobaidanasreen@gmail.com